মঞ্জরী

[সচিত্র গল্পপুস্তিকা]

শ্রীসুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

ও

গ্রন্থকারের স্বহস্তে অঙ্কিত

দুইখানি চিত্র সম্বলিত।

৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে
শ্রীপরেশনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শ্রাবণ
১৩৩৩

মূল্য বার আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,

১৫ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণ কমলেষু

বাবা—

অনেক দিন হোলো—ছোট বেলায়

লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট একটি

ফুলের গাছ পুঁতে

ছিনু

ভেবে ছিনু

যখন এই গাছটিতে

ফুল

ফুটবে

তখন

একদিন প্রভাত বেলায়

সেই ফুল

দিয়ে

মঞ্জরী গড়ে'

নিজের

হাতে

তোমার পায়ে ছড়িয়ে

দেবো।

সূচী

—:•:—

মঞ্জরী ব্যঞ্জনা।

"সুকোমল অঙ্কে নিয়া, অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি পীযূষ ধারায় ;
মমতায় বিমোহিয়া, স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি! কর পুনঃ বালক আমায়।"

'মহিলার' কবি সুরেন্দ্র মজুমদার অনেক দিন আগে এই গান গেয়ে গেছেন ; আর এই গানের সুর কোন্ বয়স্কজনেব মনে সময়ে সময়ে আকুল ধ্বনিতে না সাড়া দেয় ?

বালক-ভাবের সাধনা করতে হ'লে, মাঝে মাঝে বালক-বালিকার চক্রে ব'সে বালাচার অভ্যাস কত্তে হয়। যে মা বাবা বা বড়দি' বড়দা'রা খুকীর পুতুলের বিয়েতে অতিথি হ'য়ে উলু দিয়েছেন, মুখে শাঁক বাজিয়েছেন, লাউপাতা পেতে কুলপাতার লুচী, বক-ফুলের বেগুনভাজা, বটফলের আলুরদম, মাটীর গজা, মাটীর পানতুয়া, মাটীর আতাসন্দেশ ভোজনের অভিনয়

ক'রে কন্যাকর্ত্রীর মেয়ের বিয়ের ঘটার তারিফ্ করেছেন, তাঁরাই ক্ষণিকের জন্যে নিজের শৈশব স্বর্গের সুখ আবার অনুভব করেছেন্। যে ঠাকুরদা' ছোট নাতিটির ডাক্তারি ডাক্তারি খেলাতে রুগী সেজে গায়ে কাপড় জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে "একবার নাড়িটে দেখত ডাক্তার বাবু" ব'লে নিজের শুভ্র রোমাবৃত কর তার কচি হাতখানির দ্বারা স্পর্শ করিয়েছেন, তিনি নাতির হাতের স্বর্গের বাতির আলোর আভা হৃদয়ের মধ্যে দেখ্তে পেয়েছেন।

যেমন ছুতোরের ছেলে ভাঙা বাটালি নিয়ে খেলে, কবরেজের ছেলে গাছ গাছড়া কুড়িয়ে পাঁচনের মোড়ক মুড়তে মুড়তে খেলা সুরু করে, মাষ্টারের ছেলে বেত হাতে ক'রে, কেদারায় ব'সে, "সাইলেন সাইলেন" বল্তে বল্তে খেলার স্কুল চালায়, তেম্নি যে শিশু কাব্যকুঞ্জে জন্মলাভ করে, তার বাল্যখেলা আরম্ভ হয়, কালি, কলম, কল্পনা নিয়ে।

যে "দেবেন্দ্র মন্দিরের" বাণীপূজার মন্ত্র বীণাযন্ত্রের মধুরধ্বনির সঙ্গে মিশে বাঙলাদেশের নরনারীকে প্রায় শতবর্ষ হর্ষের সুধাসাগরে ডুবিয়ে রেখেছে, আমাদের স্নেহের সুভগেন্দ্র সেই মন্দিরেরই একটি সুন্দর শিশু।

কিশোর খেলার ছলে—সুভগেন্দ্র নাথের প্রাণের কাকলি শরৎপ্রভাতের শেফালির মত তার এই পুস্তিকাখানির মাঝে ঝরে' প'ড়ে, বহুদিনের বিস্মৃত উৎসবের বাতাস আমার এই প্রাচীন প্রাণকে পুলকিত করেছে। সুভগেন্দ্র নাথ তুমি এই শারদীয় উৎসবের সময় আমার পুরোণো প্রাণকে আবার কোরমাখানো নতুন পূজোর-কাপড় পরালে।

তোমার, আধফোটা গোলাপের মাধুরীমাখা 'কথা'-গুলির সঙ্গে আলাপ করতে করতে ক্ষণিকের জন্যে আমিও বাল্যের সারল্যতরল সুখের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলুম; পা টিপে টিপে অগ্রসর হ'য়ে যখন তুমি যশের মণ্ডপ সমীপে উপনীত হবে জানিনা তখন আমি এই মাটার মেদিনীতে থাকব কিনা, কিন্তু ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা ক'রে যাই যেন তাঁর মঙ্গল ইচ্ছায় তোমাদের বংশের প্রতিভা তোমাতে পূর্ণদীপ্তি পায়।

কলিকাতা
৫ই আশ্বিন ১৩৩৩। } শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মঞ্জরী

ললিতা

—:*:—

সে দিন ছিল মদ্র দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বরা —বড় বড় দেশের রাজ-রাজড়া মুনি ঋষিদের সব নিমন্ত্রণ হয়েছে—রাজসভা জমজমাট—রাজাদের পোষাক মণিমুক্তায় সোণারূপায় বিজলী হেনে যাচ্ছে; কাহাকেও নিমন্ত্রণ করতে বাদ যায় নি।

এমনি সময় সিংহদ্বারের নিকটে এক দীন-দরিদ্র তরুণ ভিখারীর ছেলে, ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্র-সরলতা-মাখানো ফ্যাকাসে মুখখানি—বড় সুন্দর—কোথা

থেকে এসে দাঁড়ালো—হাতে একটী কাঠের বীণ, —বোধহয় সেই বাজিয়েই ভিক্ষে করে' বেড়ায়, তাই এখানেও বাজাচ্ছিল—যেন তার বুকের ব্যথার ঝরণাটি ভাবের নির্ঝরের মত উথলে, যেন বাজনার সুর বেয়ে ঝরতে লাগল ; সকলে চমকে উঠ্‌ল—কোথা হ'তে কার এমন ব্যথা ভরা বাজনার আওয়াজ আসছে···সমস্ত দালান ঘর সভা বেয়ে তার করুণ গানের নির্ঝরিণী ঝরে পড়তে লাগল—

এমনি সময় ফুটন্ত জ্যোৎস্নার একখানি প্রতিমূর্ত্তি সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল—সমস্ত নিস্তব্ধ নিথর—রাজকুমারী ধীরে ধীরে সভায় প্রবেশ ক'রলেন—সখিরা সোণারূপার থালায় মালাচন্দন বয়ে আন্‌ছিল—তিনি ধীরে ধীরে রাজা মহারাজাগণকে অতিক্রম করছেন—ভাটেরা রাজগণের বংশ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে—ঠিক সেই সময় বাজনার তাল, ভাটের প্রশংসা ধ্বনি, সখীদের নূপুর শব্দ, সভার ঝমঝমানি ভেদ করে' রাজকুমারীর কানে গেল—তার সেই বাজনার সুরে দুঃখের নির্ঝরিণীর আওয়াজ, বাতাসের বুকে কেঁদে কেঁদে ঝিমিয়ে আসছে,—রাজকুমারী

সেই বীণের মধুর রবে আকৃষ্টা হ'য়ে ধীরে ধীরে ভিখারীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন—তারপর কম্পিত হস্তে লজ্জা করুণ মুখে বরণের মালাখানি ভিখারীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

সব হুলুস্থূল পড়ে গেল···কেউ বল্লে ও লোকটা গুণীন, কেউ বা যাদুকর বলে' মাথা নাড়তে লাগল, কেউ বল্লে লোকটার বাজনায় যাদু করা আছে। রাজা মহারাজারা ত রেগেই খুন, তাঁদের তলোয়ার খাপের ভিতর ঝণ ঝণ করে উঠল, সকলেই বলে' উঠলেন, ভিখারীর গলায় বরমাল্য দেওয়া এটা কেবল তাঁদের অপমান করা···সকলে আসন ছেড়ে চলে গেলেন।

মদ্রদেশের মহারাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তিনি এখন মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন—রাজাদের দিকে হতে গেলে রাজকন্যাকে হারাতে হয়, আর কন্যার পক্ষ হলে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়—উভয় সঙ্কট—অতএব তিনি ভাবলেন, রাজকুমারী ত চলে যাবেই তাই তিনি সত্য রক্ষা কোরে উভয় পক্ষের হয়ে বল্লেন, "মা তুমি যখন ওর গলায় বর-মাল্য প্রদান করেছ, তখন সত্যের জন্য তোমায় ত

ওর সঙ্গে যেতেই হবে, তবে তাই যাও।" রাজ-কুমারী আনন্দের সহিত রাজার দেওয়া ভাল কাপড় ভাল গহনা সব ছেড়ে ভিখারিণীর বেশ পোরে ভিখারীর সঙ্গে যেতে লাগলেন···রাজ-প্রাসাদের সানাই এ বিদায় রাগিণী বেজে উঠল··· ভিখারীও কিছু বল্লে না, দু'জনে গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগল, যেন কত দিনের ভাব।

একটি ছোট উপত্যকায় পদ্মকুমার বেঁধে ছিল তার কুটীরখানি, একটী বকুল গাছ তার কুটীরের আঙ্গিনা থেকে উঠেছে···আর ঘর খানিকে ছায়া প্রদান করছে; যেন তারা দু'জনে চিরকালের সখার বাঁধনে বেঁধে আছে। তার পাশ থেকে একটী ছোট ঝরণা কুটীরের পা ধুইয়ে দিয়ে যেন রাজ-কুমারীকে দেখে আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে নেচে উঠেছে। বহুদূর হ'তে একটী পাহাড়ের রাস্তা ঘুরে ফিরে তারি বাড়ীর কাছে এসে শেষ হয়েছে, যেন রাজকুমারীকে দেখে সে সেখানে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধ বুকে কোরে বাতাস তার অদৃশ্য ফরফরে ওড়না উড়িয়ে যেন রাজকুমারীর

সাথে দেখা করতে এলো, চাঁপাফুলের পাতাগুলি কুটীরের দ্বারে নুয়ে তাদের নবজীবনে একটা চির বসন্তের স্বপন পরশ লাগিয়ে দিতো···রাজকুমারী এখানে এসে রাজপ্রাসাদের কথা ভুলে গেছেন— এখন রোজ কাঠুরে কাঠুরিণীদের সাথে গল্প করতেন, কত রাজা রাজড়াদের গল্প শুনতেন, তার সঙ্গে তাঁর বাবারো কত গল্প কত সুখ্যাত শুনতেন, আর ভাবতেন, রাজা হওয়া কি ভীষণ কষ্ট, একবার ঘর থেকে বেরুতে পারা যায় না, এ-রকম গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে আসতো।

মাঠের কাজ সেরে ভিক্ষে করে' ক্লান্ত দেহে দিন শেষে ফল ফুল গুলি হাতে করে' যখন পদ্ম-কুমার কোমল মিষ্টি সুরে ডাকতো।

"ললিতা"

তখন সে ফিরে পেত গানভরা হাসির ফোয়ারা আর আনন্দ, সেই আনন্দে তার সমস্ত দিনের কষ্টের অবসান হয়ে যেত। ললিতা পান্তাভাত, কত রকমের বুনো ফলের চাটনি এনে তাকে খাওয়াতো।

রাজকুমারীর দিনগুলি এখানে রাজপ্রাসাদের চেয়ে সুখকর হয়ে কাটতে লাগল ; নিশীথ রাতে পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোছনার ঢেউ এসে কুটীরের আঙ্গিনায় যেন হীরের টুকরো ছিটিয়ে দিচ্ছিল··· সেই সময় পদ্মকুমার বাজাতে লাগলো তার বীণাটি ···বহুদূরে গিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো তার সুর ; রাজকন্যা বাজনা শুনতে শুনতে পদ্মকুমারের কোলের পরে ঘুমিয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে নিশ্বাসে ঐ যে গোলাপের মত রাঙা নরম ঠোঁট দুটি কাল মেঘের মত কাল চুলগুলি কপালের উপর জলকল্লোলের মত বাতাসে দোল খাচ্ছে··· ললিতা বোধহয় তখন স্বপন দেখ্‌ছিল।

ভোরে ফুল ফুটিল, পাখী ডাকিল, পূর্ব্ব আকাশে নিকষের বুকে সোনার রেখা ফুটে উঠ্‌ল— পদ্মকুমার আর ললিতা বকুল গাছের তলায় এসে বস্‌ল। পদ্মকুমার তা'র বীণাটি নিয়ে বাজাচ্ছিল, আর ললিতা তাই শুন্‌ছিল, এমন সময় সেই সুরের পর্দ্দাকে ভেঙে দিয়ে দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কাছে আস্‌লে দেখা গেল

যে, মদ্ররাজ্যের রাজা ঘোঁড়া ছুটিয়ে আসছেন; ললিতা তাড়াতাড়ি তা'র বাপকে ঘোঁড়া থেকে নামিয়ে বকুল গাছের তলায় নিশীথের ঝরা বকুলের বিছানায় বসালে—পদ্মকুমার ঘোড়াটাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে দিল।

রাজা শীকারে বেরিয়েছিলেন, পথ ভূলে এসে পড়েছেন—মন্দয় ভাল হয়—তিনি পথ ভুলেছেন বলে' আজ মেয়ে জামাইকে দেখ্‌তে পেলেন। ললিতা বন্যফল মধু আর ঝরণার জল এনে দিলে রাজা তাই তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। যাবার সময় পদ্ম-কুমারকে আশীর্ব্বাদ করে' বল্লেন, "আমি আজকে তবে ললিতাকে নিয়ে যাচ্চি।"

পদ্মকুমার কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে কুটীর ছেড়ে চলে' গেল, মনের দুঃখ চেপে রাখল, কিছুই প্রকাশ করল না, পাছে ললিতার মনে কষ্ট হয়...রাজকুমারী পদ্মকুমারের কাছে বিদায় নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তার নিজের সেই খেলার কুঁড়ের দিকে শেষ একবার ফিরে চেয়ে ঘোড়ায় চাপলেন, কেবল পড়ে রহিল পদ্মকুমার।

রাজকুমারী একবার সেই সবুজ কচি পাতা-

ভরা গাছগুলির দিকে চেয়ে দেখলেন, তাঁর মনে হ'ল যেন তা'রা তাঁকে শাখা দুলিয়ে বারণ করছে, "ওরে, তুই যাস্‌নে।"

ঝরণার জলের আওয়াজটা যেন তা'কে ডেকে বল্‌ছে, "তুই যাস্‌নে, তুই যাস্‌নে।" ললিতা নেই তবু পদ্মকুমার ভাবছে ললিতা আছে; সে রোজ দিনের বেলায় উপত্যকা ভেঙে খেয়ালী হ'য়ে তা'কে খুঁজতে বেরোয়···জোরে চেঁচিয়ে ডাকে—"ললিতা"—পাহাড় বনভূমি কেঁপে প্রতিধ্বনি উঠ্‌ত

"ললিতা"

সন্ধ্যারে সময় সে ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরে আসে, আর শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে—"ললিতাকে" ক্রমশঃ তা'র শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে যেতে লাগল, শেষে এমন হল যে আর নড়তে পারে না।

পদ্মকুমার সামনের বকুল গাছটীতে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে সেই য়্যাকা বেঁকা, ঘাস কাঁটা বন ফুলে ঘেরা বুনো পথটীর দিকে, আর ভাবে এই পথের অপর প্রান্ত মদ্ররাজ্যে গিয়েছে, যেখানে আছে 'ললিতা'······

সে আজ মরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শুক্নো পদ্মফুলের মত···।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, কিন্তু দিনের ম্লান আলোটুকু তখনো পৃথিবীর গা থেকে নিঃশেষে মুছে যাইনি। জ্যোৎস্না দেবীও ক্রমশঃ দেখা দিলেন, হঠাৎ সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নায় নিশীথিনীর কোমল ক্রোড়ে ধীরে ধীরে 'ললিতার' মত কে যেন তা'র কাছে এসে দাঁড়ালো, দ্রুত আসার জন্য তাঁ'র মুখখানি রক্তিম হ'য়ে যেন চাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল,······তখন পদ্মকুমারের মাংসহীন পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি দিনের শেষে ঝরা পদ্মফুলের পাপড়ির মত শুকিয়ে গেছে ···জ্যোৎস্না দেবীর সুধাকর স্পর্শে তার ঠাণ্ডা দেহটীর উপর যেন ম্লান তৃপ্তির হাসিটুকু ফুটে উঠেছে।

বেদনার সময় স্মৃতিই প্রবল হয়, তাই আজ পদ্মকুমারের বিরহে ললিতা পাগলিনীর ন্যায় ঘুরতে ঘুরতে বকুল গাছের তলায় বসলে। গাছ যেন তা'র পাতা ঝির-ঝিরিয়ে তা'র উষ্ণ ললাটে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিত। এদেশ সে প্রায় ভুলে

গিয়েছিল, এখন তা'র ঘুরে ঘুরে মনে পড়েছিল তা'র পরিচিত গাছতলা, কত পাথরের কোলে সে আর তার স্বামী এক সঙ্গে বসে কত গল্প করেছে, সে একবার পাথরের কাছে এসে দাঁড়ালো, পাথর যেন বল্‌তে লাগল, "বসো একবার আমার কোলে, কোমল শৈবালের আস্তরণের উপর কোমল পাদুখানি তোমার তুলে দাও।" ললিতা আর সামলাতে না পেরে পাথরের উপর লুটিয়ে পড়ে অশ্রুরাশিতে সেই পাথরকে অশ্রু সিক্ত করে তুলল।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। ললিতা, যখন কুটীরের আঙ্গিনায় আপন-হারা হ'য়ে কাঁদছিল, তখন তা'র মনে হ'ল কে যেন তাকে ডাকছে—

"ললিতা"

ঠিক যেমনি করে এমনি চাঁদনি রাতে পদ্মকুমার ডাক্‌ত।

উন্মাদিনীর মত অধীরা হ'য়ে চেয়ে দেখে সত্যই পদ্মকুমার এসেছে। পদ্মকুমার মুখে

মৃণালের হাসি ফুটিয়ে বল্লে, "আর কেন এসো, আমার সঙ্গে সেই চাঁদের রাজ্যে, যেখানে মৃত্যু, জরার ভয় নেই···চলো···চলো সেইখানেই চলো আমি সেই দেশের রাজা আর তুমি সেই দেশের রাণী, সেদেশে ধবধবে স্ফটিকের তৈরী প্রাসাদ আর জ্যোৎস্নার আলোকে আলোকিত :

পদ্মকুমার ললিতাকে নিয়ে সেই চাঁদের রাজ্যে গেল, তারার দল হার গেঁথে, মৃদু জ্যোৎস্না হাসি হেসে তাদের, অভ্যর্থনা করে তারার মালা পরিয়ে দিলো।

ভোরে কাঠুরে কাঠুরিণীরা ললিতাকে খুঁজতে এসে দেখে যে, পদ্মকুমার আর ললিতা দুজনে পাশাপাশি মহানিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। লোকেরা তা'দের দুজনকে সেই বকুল গাছের তলায় এক সঙ্গে কবর দিল। সেই গাছটী এখনও নাকি মদ্রদেশের পাহাড়ের উপর আছে।

* * * *

এখন ঐ যে তোমার চাঁদের গায়ে কালো দাগ দেখতে পাও, সে হচ্ছে ঐ পদ্মকুমার আর

ললিতার বাড়ী, সেখানে তা'রা মনের সুখে দিন কাটাচ্ছে। ঐ যে পূর্ণিমার রাত্রে দেখ দুএকটা সাদা মেঘ পরীদের মত ভেসে ভেসে চাঁদের দিকে আসে, তারা বোধ হয় ললিতার বন্ধু কাঠুরে কাঠুরিণীরা পূর্ণিমার রাত্রে ললিতার সাথে দেখা করতে আসে।

শেফালি

শেফালি

—:❋:—

বঙ্গের ঈশানকোণে কনক নগর বলে একটী দেশ ছিল। সহরের বাহিরে—বহুদূরে—জঙ্গলের মাঝে একটী বৃদ্ধ কাঠুরে বাস করত—বেচারা নেহাৎ গরীব, যা' কাঠ কাট্‌ত; সহরে নিয়ে গিয়ে খাবার জিনিষের বদলে সব কাঠ দিয়ে আস্‌ত।

কাঠুরের সংসারে কেউ নেই, ছিল কেবল একটী চোদ্দ পনরো বছরের ছেলে; মাথায় একমাথা কালো কোঁকড়া চুল, হাতের মাংশপেশী লৌহ অপেক্ষা দৃঢ় ও সবল—সারাক্ষণ তীর আর ধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতো—তা'র কপোলটী ছিল

লাল পদ্মফুলের ন্যায় টুক্‌টুকে, তার নাম ছিল, নীহার।

কাঠুরে এই মাতৃহারা ছেলেটীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত। একদিন নীহার শিকারে বেরিয়েছে—সকালে বেরিয়েছিল, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে পড়েছে, এখনো একফোঁটা জল ইস্তক খায় নি—আর শিকারে এ পর্য্যন্ত কিছু মেলেনি—রৌদ্রের অগ্নিচক্ষুর ভয়ে কেউ বাইরে নেই—জনপ্রাণীহীন—এমন কি পাখীর কলধ্বনিও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না—সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল বাতাসে প্রকৃতির সেতারে ক্রমাগত 'ঝালা' দিয়ে যাচ্ছে।

নীহার সেই সূর্য্যের খরতাপে একটী গাছের ছাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে···যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত্রি, নিশিথিনী জ্যোৎস্নার আঁচল দুলিয়ে ছুটোছুটি করছেন। অনেক রাত—পথ খুঁজলেও এখন পাওয়া যাবে না—নীহার কি করবে, গাছের তলায় শুয়ে চাঁদের মুখপানে তাকিয়ে আপন মনে তাই ভাবছিল—এমনি সময় মনে হ'ল কে যেন তা'র শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে—চম্‌কে ফিরে চেয়ে দেখে যে, একটী জ্যোৎস্নার মত

শুভ্র বালিকা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, মুখ হ'তে কোঁকড়া চুল সরিয়ে দিয়ে, নিমেষ-হারা হয়ে' তা'র মুখের পানে তাকিয়ে আছে—মাথায় তা'র এক-মাথা 'সাগরের উর্ম্মিমালার' মত কোঁকড়া চুল জ্যোৎস্না আভা পড়ে' সোনার মত দেখাচ্ছিল।

নীহার তার নীল প্রশান্ত চোখের পানে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, "কে তুমি বালিকা? তুমি কি বনের দেবী না জ্যোৎস্নার রাণী?"

সে উষার নির্ম্মল আলোকের মত হেসে উঠ্‌ল—বল্লে······

"আমি ফুলবালা—আমার নাম শেফালি—তুই আমায় চিনিস না?" শেফালি সত্য সত্যই শেফালি পুষ্পের মত বাতাসের হিল্লোলে নেচে উঠে বল্লে, "তোর নাম কি, তোর মা আছে? আমার কেউ নেই, তুই আমার বন্ধু, তুই আমার সঙ্গী, আয়, আমায় তীর ছোড়া শিখিয়ে দে, আমিও তোর সাথে সাথে শিকার করে' বেড়াব।"

এখন দুজনায় সন্ধ্যার পাগল হাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়—শেফালি ভোরের বেলা নীহারকে কত কেতকী কিংশুক তুলে দেয়, তা'কে কত বনের

রাস্তা দেখিয়ে দেয়—রাত্তির হ'লে গভীর অন্ধকারের গুহায়, শেফালি নীহারকে তা'র ঝরাফুলের আঁচলের পরে শুইয়ে দেয়······এখন নীহার তার দরিদ্র পিতার কথা ভুলে গেছে······।

নীহার আর শেফালির দিন খুবই সুখে কাট্‌তে লাগল। পূর্ব্বে দুজনাই সঙ্গীহারা ছিল··· এখন দুজনাই দুজনকে সঙ্গীর মত দেখে···কিন্তু কে জানে কার অভিশাপে নীহার শেফালিকে ফেলে একদিন স্বর্গে চলে গেল···শেফালি রহিল পড়ে'···সে সঙ্গীহারা হয়ে পাগলিনীর ন্যায় কোথায় যে চলে' গেল তা' কেউ বলতে পারে না।

* * * *

লোকেরা বলে যে নীহার আর শেফালি এখনো নাকি তাদের বন্ধুত্ব ভুলতে পারে নি···

নীহার মাটি হয়েছে আর তার বিশাল দৃঢ় বুকের মাঝ হ'তে একটী ছোট ফুলের গাছ অঙ্কুরিত হয়েছে···সেই নাকি 'শেফালী'···দুপুরে

তা'র ঐ উত্তপ্ত বুকে যতটা পারে ছায়া দিয়ে থাকে···ভোরের বেলায় তা'র বুকের উপর শেফালি তা'র কোমল ঝরা ফুলের বিছানা নাকি পেতে দেয়, আবার আপন মনে তা'র কত কি মরমের কথা নুয়ে ফিস্ ফিস্ করে' বলে।

নরেনবাবুর স্বপ্ন

মাষ্টার নরেন আমাদের পাড়ার একজন সরেশ ছেলে। তিনি একদিন ভোরের বেলায় ঘুমন্ত ভাবে তার' বোন লীলার কানটী ধরে আচ্ছা করে' ঘোরাচ্ছিলেন, আর সে বেচারী চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ী মাথায় করে তুল্‌ছিল।

খুকীর চীৎকার শুনে মা দৌড়ে এসে নরেনকে ঠাস্ করে' একটী চড় পুরস্কার দিলেন। মাষ্টার নরেন গালে হাত বোলাতে বোলাতে মুখ ধুতে গেল।

দুপুর বেলায় আমবাগানে ছেলেদের কচি আম খাবার মেলা বসে ; আমাদের নরেন সেখানে

গেলে তার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁরে, তোর কি মাথায় ভুত চেপেছে? সকাল বেলায় বোনটাকে অমন করে' কাণ ধরে' টানছিলি কেন?"

নরেন বল্লে, "আর ভাই, দুঃখের কথা বলিস্ কেন, একটা বেশ মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম, আর তার ফলে মার খেলুম।"

গল্পের গন্ধ পেয়ে, অন্যান্য ছেলেগুলো যে কটা আম পেড়েছিল, সেগুলো নিয়ে নরেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি স্বপ্নরে কি স্বপ্ন?"

নরেন একটা ছেলের হাত থেকে একটা আম কেড়ে নিয়ে এক কামড়ে খানিকটা খেয়ে একটা গাছের নীচু ডালের উপর উঠ্‌ল, আর ছেলেরা তা'র চারদিকে কেউ বা অন্য ডালে বসে' স্বপ্ন-কথা শুন্‌তে লাগল।—

* * * *

"সকালে আমাদের পূর্ণ পণ্ডিত রায়েদের ঘাটেতে চান কর্‌তে গিয়েছেন, আর আমি একটা সাবমেরিণে চড়ে বেড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে এক টান মেরে সাবমেরিণে

তুলে নিলুম ; পণ্ডিত 'কুমীর কুমীর' করে চেঁচাতে লাগলো আর তা'র চীৎকার শুনে ঘাটে যা'রা ছিল, তা'রা পড়ি কি মরি করে চোঁচা দৌড় ...।

"পণ্ডিতমশাইকে সাবমেরিণে তুলে মুখোষ খুলে বল্লুম, "কি পণ্ডিতমশায়, কাল যে বড় কাণ ধরে' বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আজ কি হয়।"

"পণ্ডিত তখন বল্লে, "দোহাই বাবা, এবার সংস্কৃতে তোমায় First করে দোব।"

"সংস্কৃতে খুব কাঁচা বলে 1st হব শুনে ভারি খুসী হয়ে বল্লুম, "আচ্ছা, দাঁড়ান পণ্ডিত মশাই, আপনাকে গোটাকতক ইলিসমাছ ধরে দিচ্ছি।"

"তিনি আমায় বল্লেন, "বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।"

"এমন সময় একঝাঁক ইলিসমাছ যাচ্ছে দেখে আমি তাদের একটার লেজ ধরে' একটান দিয়েছি, এমন সময় মায়ের চড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল, আর কোথায় বা সাবমেরিণ, আর কোথায় বা

পণ্ডিতমশাই, আমি খাটে খুকির কাণ ধরে ঘোরাচ্ছি।”

*　　*　　*　　*

স্বপ্নের কথা শেষ হ’তে না হ’তে মাষ্টার নরেন একলাফে একটা উঁচু ডালে উঠে আম পেড়ে খেতে লাগ্‌ল, আর তা’র কসিগুলো ছেলেদের মাথায় টিপ করে’ ফেলতে লাগ্‌ল।

উষা

উষা হচ্ছে একটী ছোটো ফুটফুটে মেয়ে··· পাহাড়ের উপর যে গভীর কালো মেঘের দুর্গ আছে, সে সেইখানেই থাকে। মেঘরাজ তা'কে বড় আব্দার দেন, কারণ উষা হ'চ্ছে তাঁ'র ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও ছট্‌ফটে······

উষা পৃথিবী মাসীকে বড় ভালবাসে···সে রোজ সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে; তা'র কচি গোলাপী গালদেওয়া মুখটি বড় চমৎকার, গলায় হীরের টুকরোর মত জ্বলজ্বলে 'শুকতারার' একটী লকেট, কপালে দুষ্ট মেয়েদের মত একধাবড়া সিঁদুর, যেন মায়ের সিঁদুরের কৌটা হ'তে চুরি করে' মেখে খেল্‌তে খেল্‌তে ধরার উপর ছাইরঙ্গা

ছোট্ট আঁচল লোটাতে লোটাতে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে লুকিয়ে রামধনুর রং বেরংয়ের রাস্তা দিয়ে পৃথিবী মাসির কাছে এসে কালের কত কি অজানা গল্প শুনে পালিয়ে যায়······

আমাদের সূর্য্যিমামা উষার বড় ভাই, সে বড় ব'লে একটু কুঁড়ে, ঘুম থেকে উঠ্‌তেও তাই তা'র একটু দেরী হয়···একদিন উষা তা'র বড়দা··· আমাদের সূর্য্যিমামার কাছে আব্দার করে বস্‌ল যে, তা'র সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে হবে···উষা লুকোবে আর সূর্য্যিমামা তা'কে ধরবেন···পৃথিবী মাসী হবেন বুড়ি···।

ঠিক হ'লো আলোর রেখা দেখ্‌তে পেলে সূর্য্যিমামা ভাব্‌বেন, 'রেডি'; উষা ছোট মেয়ে, সে তো চেঁচিয়ে কু···উ···কুঃ কিম্বা রেডি দিতে পারে না, তাই এই প্রস্তাব হ'ল······

ভোরের বেলা পূব গগনে আমরা আলোর একটা টানা রেখা ফুটে উঠ্‌তে যখন দেখতে পাই ···তখন দেখ্‌তে পাই যে, সূর্য্যিমামা নিস্তব্ধে তাঁ'র গভীর কালো আঁধার শয্যা হ'তে উঠে ধীরে ধীরে উষার পাছু পাছু ছোটেন, কিন্তু উষা হ'চ্ছে

মঞ্জরী

বসন্তের ছোট্ট কুঁড়ির মতই ছোট মেয়ে···সে মলয় বাতাসের ঢেউএর মত চঞ্চল, সে তা'র চপল চরণ এলোথেলো সাড়ী লোটাতে লোটাতে অনন্ত নীল আকাশের কোথায় যে উধাও হ'য়ে পালিয়ে কোন্ আঁধার কুটরিতে গিয়ে যে লুকোয় তা' এখনো পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারে নি।

তারপর যখন সূর্য্যিমামা সকাল হ'তে ঘুম থেকে উঠে উষাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে মুখ চোখ লাল করে' ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সময় যখন তাঁ'র তোরণ দ্বারে ঢোকেন, তখন দুষ্টু মেয়ে উষা কি করে জান···সে দৌড়ে এসেই পৃথিবী বুড়িকে ছুঁয়ে দিয়ে খিল খিল করে' ফের দুষ্টহাসি হেসে ওঠে, তা'রপর রাত্রি ঘনিয়ে এলে তারার বেলফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে উষা তা'র কোমল শুভ্র মেঘের কেশ গগন-ছাতে উড়িয়ে দিয়ে ঘুমের ঘোরে নিশীথ মায়ের কোলে কখন্ যে লুটিয়ে পড়ে তা' কেউই বল্‌তে পারে না।

সাগরিকা

বহুপূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্বকোণে 'সাগরপুরী' নামে একটী বিখ্যাত সহর ছিল। সেই সাগরপুরীতে একটী বৃদ্ধ ভিখারী বাস করত, তাহার নাম ছিল ঝঞ্ঝা। এ কথা সত্য যে ঝঞ্ঝা সত্য সত্যই ঝঞ্ঝা-বায়ের ন্যায় খেয়ালী ছিল ; তা'র মুখটী লম্বা লম্বা কাঁচা পাকা দাড়ীতে আবৃত ছিল, আর মাথায় ছিল এক মাথা পাকা সাদা ধব্‌ধবে রূপার মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুল বাতাসের সঙ্গে সারা ক্ষণ উড়ে উড়ে খেলা করছে। তা'র বয়স হয়েছিল অনেক কিন্তু মনটী ছিল তাজা গোলাপের মত তরুণ।

তা'কে রাজার কাছে গান শুনিয়ে পাওয়া হাতীর দাঁতের বীণাটি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে, আপন হারা হ'য়ে বনের মাঝে তা'র বীণার সোণার তারে হাত খেলাতে খেলাতে খ্যাপার মত ঘুরে বেড়াতে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত—— তা'র বাজনার এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, আধফুটন্ত ফুলের কুঁড়ি তা'র গানের সুরে ফুটে উঠত ; পাখীরা গানের সুরে তা'দের ডানা গুটীয়ে তা'র আশ পাশে বসে' বাজনার ও গানের অভিনব ছন্দের তালে তালে অস্ফুট কাকলী ধ্বনি করে উঠ্‌ত—এমন কি তা'র ঐ কোমল মৃদু গানের তালে হিংস্রক বাঘ ভাল্লুকও পোষ মেনে সঙ্গীর মত পেছু নিত।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। ঝঞ্ঝা আপনারে ভুলে গিয়ে বীণা হাতে আত্মহারা হ'য়ে বাজাতে বাজাতে সাগরপুরীর সাগর ধারে এসে পৌঁছুল— তখনকার কালে সমুদ্র ছিল খুব শান্ত প্রকৃতির— ঢেউ নেই, আওয়াজ নেই, ছিল কেবল অতল কালো থম থমে জল আর তা'র উপর রাতাস লীলাময়ি উচ্ছ্বাসে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

সাগর তীরে নির্ম্মল বালুরাশির উপর বসে' সে আপন মনে বীণা বাজিয়ে গাইতে লাগ্‌ল——এই গানের সুরে সকল প্রাণী এমন কি যা'দের প্রাণ নেই তা'দেরও অন্তরের মাঝে সুরের সাড়া দিয়ে 'ঝঞ্ঝা' সুরের ঝঞ্ঝা-বাত লাগাতে লাগল। এই সময় কখন তা'র বাহু হতে বীণাখানি স্খলিত হ'য়ে পড়ে গেছে সে নিজেই তা' জানে না—এখন বাতাস এমন কি নীরব সমুদ্রও তা'র গানের সুরে পাগলা হয়ে উঠেছে—উন্মাদ মলয় বাতাসের অনুরোধে ঝোড়ো হাওয়া, তা'কে হাওয়ার ঝাপটা মেরে অলকপুরীতে নিয়ে রেখে এল—কেবল সাগর ধারে তা'র বীণাটী রহিল পড়ে—জলবালারা জল নিয়ে খেলা করতে করতে সাদা বালির সোপান হ'তে সেই অপূর্ব্ব বীণাটী কুড়িয়ে পেলে, আর সমুদ্রের তলায় পাহাড়ের গহ্বর মাঝে বসে বাজাতে আরম্ভ করলে—বীণার পাগলা সুরে তা'রাও পাগল হ'য়ে অনন্তকাল হ'তে বাজিয়ে আস্‌ছে—নিজেদের নিজেরাই আর থামাতে পারছে না।—

এখনো তোমরা যদি কেউ সাগর ধারে যাও তাহ'লে শুনতে পাবে—তা'র বীণার প্রাণ-মাতান

সুর, সাগর গর্ভে ক্রমাগতই গুণ গুণ করছে—
এখনো সকাল বেলা দেখতে পাবে, বীণার লাল
রঙের সোনার তার সারি সারি সমুদ্রের ওপর
ভেসে দিবানিশিই ঝঙ্কার দিচ্ছে—আর সূর্য্যিমামা
এখনো সেই সকাল বেলার সাগরের গীত শোন-
বার জন্যে ভোর হ'তে না হ'তেই উঁকি মারেন—
বৈশাখ মাসে তোমরা দেখতে পাবে, সমুদ্রের
ভিতর সুরের গুণ-গুণাণি সাগরকে শুদ্ধ চঞ্চল
করে' তুলে বেলাতটের উপর বীণার সোনার
তারে ঝনতকার দিয়ে আছড়ে পড়ছে।

ঘুড়ি
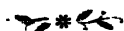
স্কুলের ছুটী ৪টায় হয় বটে, কিন্তু আমাদের হরিশের ভাগ্যে ৫টার আগে আর বাড়ী ফেরা হয় না ; স্কুলের ক্লাস টিচারের (class teacher) কাছে বেত আর বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো,, নীলডাউন নিত্যবরাদ্দ বলে' ধাতে স'য়ে গিয়েছিল কিন্তু আজ আবার পণ্ডিত মহাশয়ের গাঁট্টা তা'র মগজ বিগড়ে দিয়েছিল, তা'র ওপর ফাউ স্বরূপ ভূগোলের মাষ্টার 'নীল নদী চীনে' শুনে কমফাইন্ করে' গেলেন—আচ্ছা বাবু—থাকিস্ বাঙালা দেশে, কলিকাতায় —নীল নদী কোথায়—তা' জানবার জন্যে অত মাথাব্যথা কেন—আর হরিশেরই বা দোষ কি, চীনেম্যানগুলো যে রকম নীল পোষাক পরে,

তা'তে যে ওদের দেশের নদীর নাম নীল না হ'য়ে সাদা হবে—তা' সে কেমন করে জানবে ?

বাড়ী এসে কোনরকমে বইগুলো ডেক্সের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাবারটা রাক্ষসের মত গিলে ছাদে গেল—আজ হতভাগা ভূগোলের মাষ্টারটা সব মাটী করে দিলে, ওর চাইতে যদি পঞ্চাশ ঘা বেত মারত তা'তে দুঃখ ছিল না—কিন্তু কমফাইন—তা'র উপর কাল পাশের বাড়ীর তেলের কুপো ছেলেটী তা'র ঘুড়িখানিকে অনেকখানি সূতার মাথায় কেটে দিয়েছিল—আজ তা'কে প্রতিশোধ দেবার জন্য সে সকালবেলা ফকির চাকরকে পয়সা দিয়ে মাঞ্জা দিয়েছে—আর আজিই কি না কমফাইন—দুত্তোর তোর ভাল হ'ক—।

যাক তবু ভাল, তেলের কুপোর ঘুড়ি এখনো আকাশে রয়েছে, হরিশের মাথার টন্‌টনানি অনেকটা ভাল হল—বৈশাখের উত্তপ্ত বাতাস ঘুড়িটাকে আকাশে নিয়ে গিয়ে তা'র উত্তপ্ত মনটাকে ঠাণ্ডা কর্‌লে—কিছুক্ষণ পর তা'র ঘুড়িটী পাশের বাড়ীর ছেলেটীর ঘুড়িটাকে কেটে দিয়ে কালকের অপমানের প্রতিশোধ নিলে।

জয়ের আনন্দে সে সুতো ছাড়তে লাগ্‌ল, আঙ্গুলের ফাঁকে খস্‌খস্‌ শব্দে লাটাই বাঁইবাঁই করে ঘুরতে লাগ্‌ল, হাওয়ার জোরে ঘুড়ি ক্রমেই উঁচুতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষকালে মেঘের সাথে মিলিয়ে গেল—হঠাৎ কালবৈশাখীর মেঘ কাল বরণে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে, একটা ঝোড়ো হাওয়া এক ঝাপটায় লাটাই শুদ্ধ হরিশকে নিয়ে চল্ল, একটু থাম্‌ছে—অমনি দমকা হাওয়ায় তা'কে দ্বিগুণ দূরে নিয়ে যাচ্ছে—

হরিশ ভাবলে, সে এবারে মহাভারতের ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠীরের মত সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছে—তা'র খুব আনন্দ হ'ল, স্বর্গ সেখানে কি আছে তা' কেউ জানে না—কবির কল্পনা রাজ্য—সাধুদের সাধনার ধন—সেই স্বর্গে সে যাবে—তারপর মরে' নয়—সশরীরে—যখন সে ফিরে আস্‌বে ওঃ কি মজাটাই না হবে, সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে নাম দিয়ে হেডিং বেরুবে ঃ—

হরিশ বাবুর স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন

লোকেরা ভিড় করে' কিনে আশ্চর্য্য হয়ে

পড়ে ভাববে, এ আবার কোন্ মহাত্মা—দলে দলে লোকে তাকে দেখতে আস্‌বে—বটতলায় বই বেরুবে ওঃ—তার আর আনন্দ ধরছিল না—

একটা দরজার কাছে এসে ঝাপটা হাওয়া বন্ধ হ্‌ল,—মলয় বাতাস স্থগন্ধে তা'র প্রাণ মন আনন্দে নেচে উঠল সে ভাবলে এইবার স্বর্গের দ্বারে এসে পৌঁছেছি—এতদূর যখন আসা গিয়েছে তখন ইন্দ্রর সঙ্গে না দেখা করে' গেলে হয়ত সে বেচারী ত্বঃখ করবে, তাই সে ষ্টাইল দেখিয়ে খাকী প্যাণ্টের পকেটে হাতদিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া বাসের একখানা টিকিটে নাম লিখে দরওয়ানের হাতে দিয়ে বল্লে "ইন্দর সাবকো পাস্ লে যাও।"

কিন্তু প্রহরীগুলো কি rude, স্বর্গে বোধ হয় কোন পাঠশালা নেই, আর সেখানকার লোকেরাও ভদ্রলোকের সঙ্গে কিরূকম ব্যবহার করতে হয় তা' জানে না, তাই কিনা ব্যাটারা বল্লে, "ইন্দর সাপ্ নন্দন কাননমে বাঘ আউর সিং শিকার করনে গিয়া—আবি মুলাকাৎ হোগা নেহি, তুম কাঁহাসে আয়া—ভাগো—নিকালো—।"

হরিশ বেচারী আর কি করে—বড় লোকদের বাড়ীর দরওয়ানগুলো যে এইরকমই হয় তা' তা'র ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় জানা ছিল না সেইজন্য স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে শোনা কতকগুলো ইংরাজি গালাগালি জানা ছিল যদিও তা'র অনেকেরই মানে জানত না—তবুও সেই শোনা নেটিভ, নিগার, ষ্টুপিড্, সোয়াইন কোথাকার প্রভৃতি গালাগালি দিয়ে মনের দুঃখ খানিকটা লাঘব করলে,...এমন সময় পূর্ব্বদিক আলোকিত করে' পান চিবুতে চিবুতে চন্দ্র ব্যস্তহয়ে ডিউটীতে বেরুচ্ছিলেন, দরজায় গণ্ডগোল শুনে সেইদিকে গিয়ে হরিশকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "কে তুমি, কি চাও ?"

হরিশ বল্লে, "আমার নাম হরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কল্‌কাতা থেকে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

কল্‌কাতা থেকে এসেছে শুনেই চন্দ্রের চক্ষু চড়কগাছ, তিনি আর অপেক্ষা না করে একদম সোজা দৌড়—একেবারে যমের কাছে উপস্থিত।

চন্দ্রকে অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আস্‌তে

দেখে যম বল্লে, "কি হে ব্যাপার কি? তোমার না নাইট ডিউটি?"

চন্দ্র হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন, "আর ডিউটি, এদিকে সর্ব্বনাশ, স্বর্গে কল্‌কাতা থেকে একজন জ্যান্ত মানুষ এসেছে।"

জ্যান্ত মানুষ শুনেই যমের চোখ কপালে উঠ্‌ল—জ্যান্ত মানুষ যে কি চীজ, তা' জানবার সৌভাগ্য একবার হয়েছিল, তিনি আর কালবিলম্ব না করে এর্লাম দিয়ে সমস্ত সৈন্য জড় করলেন, তারপর সসৈন্যে হরিশের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কলিকাতায় সম্প্রতি যে দাঙ্গা হয়েছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ হরিশের জানা ছিল। তাই এতগুলো লোক্‌কে লাঠি সোঁটা তরোয়াল নিয়ে গণ্ডগোল করে' আসতে দেখে সে ভাব্‌লে কল্‌কাতার হাওয়া বোধ হয় এখানেও লেগেছে; অতএব এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ঠিক করে ঘুড়ির সুতো ধরে' নীচে নাম্‌তে লাগ্‌ল। যমদূতেরা দু একটা লাঠি তা'র দিকে ছুঁড়ে মার্‌ল।

*　　*　　*

হরিশের জ্ঞান হ'লে দেখে যে, সে বিছানায় শুয়ে, তা'র মা মাথায় আইসব্যাগ নিয়ে বসে আছেন, আর একজন ডাক্তার বসে রয়েছেন ; আর পিসিমা কাঁদছেন "ওরে হরিশ রে—"

পরে শুন্‌লে যে, ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে হাওয়ার টাল সামলাতে না পেরে পড়ে' গিয়েছিল।

কেতকী

সিন্ধুপুর বলে' একটী দেশ ছিল, তা'র তিনদিক কাল পাহাড়ে ঘেরা, যেন বিকটাকার দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে দেশটীকে রক্ষা কর্‌ছিল। তা'দের মাথায় বড় বড় ঘন তাল তমাল নারিকেল বৃক্ষগুলি সবুজ খাড়া খাড়া চুলের মত দেখাচ্ছিল—আর সিন্ধুপুরের সামনে ছিল দিগন্ত-ব্যাপী নীল সমুদ্র—তা'র নীলিমার নীল অনন্ত সৌন্দর্য্য উপ্‌ছে উঠে বেলা-তটে কেবলি আছাড় মারছে—সেই সমুদ্রের অনন্ত নীল বক্ষে একটী ছোট্ট সবুজ ছবির মত দ্বীপ, যেন প্রকৃতির ক্ষুদ্র অর্ণবপোতের মত তরঙ্গের তালে তালে কেবলি নেচে উঠছে বলে' মনে হয়—দ্বীপটীর নাম হচ্ছে জ্যোৎস্নাপুরী—সমীর হচ্ছে

জ্যোৎস্নাপুরীর রাজা, আর মিহির হচ্ছে সিন্ধুপুরের রাজা।

"এক কম্বলে দশজন সন্ন্যাসী বাস করিতে পারে, কিন্তু দু'জন রাজা পাশাপাশি থাকতে পারে না" প্রবাদ বাক্যটী সত্য হ'লেও এক্ষেত্রে তা'র ব্যাতিক্রম হয়েছিল—দু'জনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। যদিও সমীরের রাজ্য ছিল অসীম সাগরের মাঝে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, আর মিহিরের পর্ব্বত বৃক্ষ, ধনরত্নপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল—তা' হ'লেও মিহির সমীরকে ছোট ভায়ের মতই স্নেহ কর্‌ত।

মিহিরের ছিল একটী পরমাসুন্দরী মেয়ে—তা'র নাম কেতকী; রাণীমা তা'কে আদর করে' ডাকতেন কেয়াফুল—যদিও সে কিশোরী, তবুও সে বালিকার মত চপলা—বেশ সুন্দর দেখতে তা'কে, ভ্রুদুটী ধনুকের মত, নাকটী টিকালো—চোখ দুটী হরিণের চোখের মত টানা, কপালে চূর্ণকুন্তল সারাক্ষণ উড়্‌ছে, মাথায় কাল মেঘের মত অলকদাম।

বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ অপরাহ্নে সমীর, ক্লান্ত

মনকে পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যাকার ক্রোড়ে স্নিগ্ধ করবার জন্য সিন্ধুপুরে অতিথি হ'ল। সারাদিনের পর সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হ'লেন, তাঁ'র লাল আভা সমুদ্রে পড়ে' এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়ে উঠেছে। কেতকী তা'র প্রাসাদ-তোরণে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই অসীম রূপকে উপভোগ কর্‌ছে, তা'র মুখ খানির উপরও সূর্য্যদেবের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে যেন কে এক ড্যালা আবীর মাখিয়ে দিয়েছে।

সমীর অসীমের ধারে দাঁড়িয়ে স্রষ্টার অপূর্ব্ব কারিগরি দেখছিল। ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব বিদায় লইলেন, তাঁ'র শেষ রশ্মিটুকু জলকে পরশ পাথর ছুঁইয়ে সোনা করার মত লাল করে' অন্তর্ধান হ'লো—সন্ধ্যা আকাশের কোলে দেখা দিল—সমীর প্রাসাদে ফিরতে আরম্ভ কর্‌লেন; তাঁ'র চোখে পড়ে' গেল—প্রাসাদ-তোরণের উপর সন্ধ্যার ম্লান আলোকে পরাস্ত করে' নিজের রূপে নিজে আলো করে' দাঁড়িয়ে থাকা কেতকীকে—কেতকী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল—সমীরও প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে যে প্রতিমাকে তোরণ শীর্ষে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখেছিলাম সে কে?—এই আলোচনায় সমীরের রাত্রে নিদ্রা হ'ল না।

প্রভাতী নহবৎ বেজে উঠল—পাখীরা জগৎ পিতার স্তুতি বন্দনা করছে···সমীর বাগানে বেড়াতে গেলেন—বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হ'য়ে সৌগন্ধে দশদিক আমোদিত করেছে··· এমন সময় মাধবীলতার কুঞ্জে সমীর কেতকীকে দেখতে পেল—আপন মনে মল্লিকা মধুমঞ্জরী দিয়ে মালা গাঁথছে—যেন প্রস্ফুটিত পদ্মসম আপনার রূপের লালিমায় আপনি ফুটে উঠেছে। কতকগুলি ফুল শরৎ প্রভাতের শুভ্র শিশির কণার মত ঝরে পড়েছে; তা'র আঁচল-খানি মাটিতে লুটায়ে পড়েছে—সবই যেন হেলা ফেলা—এমনি সময় কেতকীর চোখ সমীরের উপর পড়ল।

প্রভাতের তরুণ তপনের রঙ্গিন আলোর মত সমীরের মুখখানি লাল, তা'র প্রশস্ত বক্ষ বীরের যোগ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেছিল—তা'র চোখ

দুটী যেন জলজ্বলে—দু'জনেই চোখের চাওয়ায় দু'জনকে ভাল বেসে ফেল্লে—

সমীর বল্লে, "আপনার রূপে আপনি বিকশিয়া কে তুমি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিলে? অয়ি রূপসি! কাননকুন্তলা একলা কানন কুসুমের মত নীরবে কেন হেথা ফুটে? চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ মণি হয়ে ধূলায় ধুসরিত হ'য়ে কেন হেথা লুটিয়ে আছো—চলো মোর দেশে—সাগরের দ্বীপের মাঝে সাগর-রাণীর মত থাকবে"—সমীর কেতকীর হাত দুটী ধরে' ব্যাকুল দৃষ্টিতে তা'র জবাব শুনবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজকুমারী কোন উত্তর না দিয়ে লজ্জাকরুণ মুখে কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে স্বরচিত মালাখানি সমীরের গলায় পরিয়ে দিলে—সমীরের চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল—সেও কেতকীকে সোনার হার পরিয়ে দিলো—বিহগ-কাকলী তা'দের মিলনোৎসবের সানাই বাজাতে লাগল—নববধুর মুখখানি ভাল করে' দেখবার জন্যে সূর্য্যদেব গগনের উপর উঠলেন—বৃক্ষসকল নিজেদের বৃন্তচ্যুত পুষ্প-দ্বারা নব দম্পতীকে যৌতুক দিলে—বীথিকা পুষ্প-

ময় হ'য়ে উঠল—তারপর দু'জনে জ্যোৎস্নাপুরীর দিকে যাত্রা করল।

সখীরা দূরে ফুল তুলছিল—তা'দের সাজী বেল মল্লিকা যূথীতে ভরে গিয়েছিল—কেহ কেহ বা রাজকুমারীকে সাজাবার জন্য ফুলের অলঙ্কার তৈরী কর্‌ছিল—বলয় হার গাঁথা হ'লে তা'রা রাজ কুমারীর সন্ধানে এসে দেখে কেউ নেই—মাধবী লতার কুঞ্জ খালি—কেবল পড়ে আছে কতকগুলি মধুমঞ্জরী—রাজকুমারী নেই—তা'দের আদরও নেই—সেই জন্যই অভিমানে মাটীতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

সখীরা ভাবলে এ বুঝি এক নূতন খেলা, রাজ-কুমারী কোন কুঞ্জে লুকিয়ে আছে, তাই তা'দের আনন্দ বেড়ে উঠ্‌ল, তা'দের গানের সুরে আকাশ ভরে উঠ্‌ল, তা'দের নূপূরধ্বনি গগনের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করলে। তা'রা দলে দলে সমস্ত কুঞ্জ খুঁজতে লাগল, কৃত্রিম পাহাড়ের গুহায়, ঝরণার ধারে, সরসী তটে, এমন কি রাজকুমারীর প্রিয় ময়ূর ময়ূরীর ঘরও বাদ দিলে না—

কিন্তু হায়—খোঁজাই সার হ'ল, রাজকুমারীকে তা'রা বের করতে পারলে না, তা'রা ক্লান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে' রাগিণী ধ্রলে, তা'দের গানের ভাষায় তা'রা রাজকুমারীকে জানাতে লাগল যে, 'তারা পরাজয় স্বীকার করেছে, অতএব হে প্রিয় সখী, এসো, ফিরে এস'—গানের শেষ কলি প্রতি-ধ্বনি লুফে নিয়ে আবার তা'দেরই উপহার দিলে কিন্তু কেউ ফিরে এল না, কিম্বা গানের সুরে উত্তর এলো না যে, 'সখী আমি এখানে আমি এখানে…'

সখীদের প্রাণে ভয় হ'ল তবে কি সখী বাপী-তটে তা'র প্রিয় মাছগুলিকে আদর করতে গিয়ে ডুবে গেছে।

রাজপুরী হ'তে দ্বিপ্রহরের নহবৎ ধ্বনি বেজে উঠ্‌ল, রাণীমা দাসী পাঠালেন রাজকুমারীকে ডেকে আন্‌তে—সখীরা বিষাদ-ভরা মুখখানি নিয়ে অন্তঃ-পুরে ফিরে এল, তা'দের ভাব দেখে রাণীমার বড় ভয় হল, তা'দের সে চপলতা নাই, যে চঞ্চল চরণে প্রাসাদ কেঁপে উঠ্‌ত আজ তা' ধীর নম্র দেখে রাণীমা ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়া, আমার কেয়াফুল কোথায় ?"

সখীদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বেরুল না, কেবল তা'দের চোখ দিয়ে মুক্তার মত জল ঝরে' পড়তে লাগল, রাণীমা আর স্থির থাকতে পারলেন না, উন্মাদিনীর মত জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে আমার—আমার কেয়া কোথায়।"

সখীদের চোখের জল ঝরণার মত বেগে পড়তে লাগল, একটা অনর্থ কিছু হয়েছে ভেবে রাজসভায় খবর গেল,সভা ভঙ্গ হল—রাজা অন্তঃপুরে এলেন ; সমস্ত শুনে খুজতে বেরুলেন ; প্রহরীর দল বাগান ভর্ত্তি করে ফেল্লে, তাদের কঠিন পদপীড়নে কত লজ্জাবতী লতার জীবন নষ্ট হল, জেলেরা সরোবরে জাল ফেল্লে।

জালে উঠল, বড় বড় রুই মৃগেল ; কিন্তু রাজকুমারীকে পাওয়া গেল না, রাজা কোন রকমে চোখের জল চেপে প্রাসাদে ফিরলেন।

অন্তপুরেই পা দিতেই রাণীমা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন "কৈ আমার কেয়া কৈ ?'

রাজা অশ্রুসিক্ত মুখে বল্লেন, "তা'কে পাওয়া গেল না।" পাওয়া গেল না শুনেই রাণীমা অজ্ঞান

হয়ে পড়লেন, দাসী আর পুরমহিলারা তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হ'লেন।

রাজা একজন প্রতিহারীকে সমীরকে ডেকে আনতে বল্লেন সে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বল্ল, "সমীর নেই।"

সমীর নেই শুনে রাজার চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগ্‌ল, তিনি বুঝতে পারলেন, সমীরই কেতকীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি সেনাপতিকে সৈন্য সাজাতে হুকুম দিলেন—দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগ্‌লেন, "ওঃ! বিশ্বাসঘাতক ; আমি এতকাল তা'কে ছোট ভায়ের মতন স্নেহ করে' আস্‌ছি আর আজ তার প্রতিদান বুঝি এই? আর কেয়া কেয়া—আমাদের কেয়া—সেও না বলে' চলে গেল!" রাজার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে পোষাক ভিজিয়ে দিলে, কিন্তু তাঁ'র মনের আগুন একটুও নিবল না।

সেনাপতি এসে খবর দিলেন, সৈন্য প্রস্তুত। রাজা আর কালবিলম্ব না করে' সসৈন্যে সাঁজের বেলার ঝড়ের মত জ্যোৎস্নাপুরীর দিকে রওনা হ'লেন।

এদিকে রাণীমার জ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁ'র মুখে 'কেয়া' ছাড়া অন্য কথা নাই।

ওদিকে কেতকী আর সমীর আপনহারা হ'য়ে হাত ধরাধরি করে পথ চলছিল, তা'দের চোখে মিলনের জন্য যেন সারা জগৎ মধুময় হ'য়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় তা'রা জ্যোৎস্না-পুরীর দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল—ক্রমে তা'রা সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছুল।

মিহির সৈন্য সামন্ত নিয়ে রণবাদ্য বাজিয়ে গ্রাম, পর্ব্বত, নদ, নদী অতিক্রম করে' জ্যোৎস্নাপুরীর দিকে রওনা হ'লেন, সৈন্যদলের রণপতাকা আকাশে পত্‌পত করে উড়্‌ছিল, বীরের হৃদয় রণ উন্মাদনায় নেচে উঠ্‌ছিল, তা'দের হর্ষধ্বনি প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে সজীব করে তুল্‌ছিল—।

পৃথিবীর উপর এই রণযাত্রা দেখে, তা'দের রণবাদ্য শুনে বোধ হয় মেঘেরও বীর হৃদয় যুদ্ধ কামনায় অধীর হ'য়ে উঠেছিল, তাই সে জ্যোৎস্নার আলোকের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করে সসৈন্যে কালমেঘের দ্বারা চন্দ্রের জ্যোতিকে গ্রাস করে ফেল্লে—মেঘের সেনাপতি ঝড় প্রভূত পরাক্রমে

সুধাংশুর সহচর তারকাদলকে বিধ্বস্ত করলে—বজ্র মুহুর্মুহু তার পিণাক ধ্বনি দ্বারা মেঘও ঝড়কে রণে উত্তেজিত করছিল, বৃষ্টি চন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে দরদর ধারে কাঁদতে লাগ্‌ল।

আকাশে যুদ্ধ দেখে সমুদ্রের প্রাণে খুব স্ফুর্ত্তি হ'ল, সেও নিজের তরঙ্গ দ্বারা মেঘকে অভিনন্দন করে তা'র অযুত বাহু মেলে' পৃথিবীকে গ্রাস করতে এলো

তা'র তরঙ্গমালা সাগর-তট হ'তে মেঘের নিকট যাইয়া সহানুভূতি জানালো।

সমীর কেতকী সমুদ্রের ধারে ব্যাকুল নয়নে জলের দিকে চেয়ে রইল—দূরে—অতি দূরে বিদ্যুতের আলোয় জ্যোৎস্নাপুরীর ক্ষীণছায়া ক্ষণিকের তরে তা'দের চোখে পড়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল—

কিন্তু যাবার কোনও উপায় নাই—সহসা কেতকীর চোখে পড়্‌ল ছোট্ট একখানি নৌকা বালির রাশির উপর বাঁধা রয়েছে—সমুদ্র তা'র বিরাট বপু নিয়ে তা'কে গ্রাস করবার জন্যে চেষ্টা

করছে এবং বিফল হ'য়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় নূতন উদ্যমে আক্রমণ করছে—

দুজনে দৌড়ে সেই নৌকার কাছে গেল সমীর চিৎকার করে ডাক্‌ল—"মাঝি ও মাঝি।"

সমুদ্রের গর্জ্জনে তা'দের কথা শূন্যেতেই মিলিয়ে গেল—দূরে একখানি জীর্ণ পর্ণ কুটীর দেখে দুজনে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে—পাতার কুঁড়ে ঘরের জীর্ণ তাল-পত্রের দরজাখানি সমীরের সবল বাহুর কঠোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে খুলে গেল, ঘরের ভিতরে একজন বৃদ্ধ পাটের দড়ি তৈরী করছিল—

বৃদ্ধ রুক্ষ মেজাজে ঘরের বাহিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে "এই দুর্য্যোগে কে হে বাপু তুমি, কি চাও, কেন আমার ঘরের দরজা ভাঙলে?"

সমীর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বল্লে, "তুমি, মাঝি—তুমি মাঝি—আমাদের জ্যোৎস্না-পুরীতে পৌঁছে দিতে পার,—টাকা—যত টাকা চাও দোব।"

বৃদ্ধ একবার সমীরের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "তুমি কি পাগল না আর কিছু, এই তুফানে

লোকে ঘরের ভিতর থাকৃতেই সাহস করে না, আর তুমি বল্‌ছ কি না সমুদ্রে পাড়ি দিতে···হাঃ হাঃ"—তা'র উচ্চ হাস্য ধ্বনি সমুদ্রের ভারি ভাল লেগেছিল, তাই সে একটা উচু ঢেউ দিয়ে মাঝিকে অভিনন্দন করে গেল—বৃদ্ধ এই বলে তা'র দরজা মেরামতের দিকে মন দিল।

সমীর তা'র হাত ধরে টেনে বল্লে—"ও, দরজা থাক্, আমি তোমায় সোনার কপাট করে দোব। আমায় পার করে দাও—আমি জ্যোৎস্নাপুরের রাজা—ইনি সিন্ধুপুরের রাজকুমারী—তুমি পার করে না দিলে রাজার হাতে আমাদের প্রাণ যাবে- দোহাই তোমার—পার করে দাও—যত টাকা চাও দোব—"

প্রকৃতির হট্টগোলে মাঝি বোধ হয় কিছুই শুনতে পেলে না, তাই কোন জবাব দিল না— দূরে সমুদ্রের গর্জ্জন্‌কে পরাভূত করে রণবাদ্য শোনা গেল, দূরে সিন্ধুপুরের সৈন্যদের মশাল দেখ্‌তে, অশ্বের হ্রেষারব শুন্‌তে পাওয়া গেল।

সমীর আর একবার বল্লে, "ওই ওরা এসে

পড়েছে, আমায় পার করে দাও,—না হয় তোমার দাঁড় দাও, আমিই নিজেই পার হই।”

মাঝি সে কথার কোন উত্তর দিল না—সৈন্যদের কলরব ক্রমে নিকটে আসতে লাগ্‌ল।

কেতকী আর থাক্‌তে না পেরে মাঝির সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে বল্লে, “ওগো তোমার ছুটী পায়ে পড়ি—আমাদের বাঁচাও—ঈশ্বরের ধর্ম্মের দোহাই—দয়াকর”—সে আর কথা বল্‌তে পার্‌লে না, তা’র চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগ্‌ল—বিদ্যুতের এক ঝলক আলো তা’র মুখের উপর পড়ল।

বিদ্যুতের আলো কেতকীর মুখে পড়তেই মাঝির মনে পড়ে গেল—তা’র মেয়ের কথা, সে ভাবতে লাগ্‌ল যে, সে বেঁচে থাকলে এতদিনে এত বড় হ’ত—সেও এমনি না এর চেয়েও স্নুন্দর ছিল।

বৃদ্ধ কোন কথা না বলে’ ঘরের ভিতরে গিয়ে তা’র দাঁড়টী নিয়ে এসে বল্লে, “মা—তোমার ভয় নেই, আমি তোমাদের পার করে দোব—এর চাইতে অনেক বেশী তুফানে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি।” তার পর সকলে মিলে নৌকাটাকে জলে

নামালে, মাঝি 'বদর—বদর' বলে নৌকা ছেড়ে দিলে; প্রকৃতির রুদ্র বক্ষের উপর নৌকাখানি নাচ্‌তে নাচ্‌তে জ্যোৎস্নাপুরের দিকে রওনা হ'ল।

সিন্ধুপুরের সৈন্যদল রাজার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছুল; কিন্তু হায় কোথাও তা'দের রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগ্‌ল, বড় বড় গাছ পড়ে' ধূলায় লুটাতে লাগ্‌ল, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো মানবের প্রাণে আতঙ্ক বৃদ্ধি করে' তুল্‌ল।

বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় মিহিরের নজর পড়ল—উন্মাদ সমুদ্রের কালো বিশাল বুকের উপর একখানি ছোট্ট নৌকা, প্রকৃতির বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, গগনচুম্বি তরঙ্গের আঘাতে নৌকা-খানি এক একবার উর্দ্ধে উঠ্‌ছে, পরমূহর্ত্তে গভীর অতল জলে মিশিয়ে-যাচ্ছে।

সেই মূহর্ত্তের দর্শনে তিনি বুঝ্‌তে পারলেন, এই ভীষণ প্রলয়ের মুখে ঐ দু'টী ছন্নছাড়া আর কেউ নয়,—তাঁরই সমীর ও কেতকী। তা'দের পরিণাম কি তা' বুঝতে রাজার বেশী কষ্ট হ'লনা

—তাই তাঁর সমস্ত ক্রোধ দূর হ'য়ে গিয়ে স্নেহ হৃদয় অধিকার কর্‌লে, তাঁ'র মনে পড়ে গেল—সে যে তাঁ'রই কেতকী, তাই পিতৃস্নেহ ক্রোধকে জল করে' দিয়ে সেই মরণপথের যাত্রীদের ডাক্‌লে, '—ওরে ফিরে আয়—ওরে ফিরে আয়—'প্রতিধ্বনিও তা'র তালে তালে ডেকে বল্ল—'ওরে ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়'—

এই ঢেউতে বুঝি নৌকাখানি অতল জলে তলিয়ে যায়, তিনি বিকট চীৎকার করে বলে' উঠ্‌লেন—"ওরে অভিমানিনী ফিরে আয়"—বিজলিবালা তাঁর বৃথা ক্রন্দনে হেসে উঠ্‌ল, তা'র সোনার দাঁত মুখের ফাঁক থেকে দেখা গেল—ব্যস সব্‌ শেষ—নৌকার চিহ্ন নাই—সর্ব্বগ্রাসী তাকে গ্রাস করেছে।

রাজার নয়ন দিয়ে অশ্রুর বন্যা বহিল; উন্মাদের মত বলতে লাগলেন—"মাগো, মা কেয়া, স্নেহের পুত্তলি আমার, শুধু তুই আমার সংসারের ধন ছিলি, ফিরে আয়,—বিদ্যুতালোকে দেখলেন, কি যেন ভেসে আস্‌ছে।

রাজা ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টিতে সমুদ্র তরঙ্গের ফেন-

পুঞ্জে হাতড়াইতে লাগিলেন—সমুদ্র তাঁ'র মনো-ভাব বুঝে এক আঘাতে সেটাকে কুলে নিক্ষেপ করলে—রাজা "ফিরে এসেছিস"—বলে' পাগলের মত তা'র দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে—তাঁ'রই কন্যা জামাতা ফিরে এসেছে, কিন্তু শূন্য প্রাণে। মরণের দ্বারেও তুজনের হাতে হাতে ধরা—তা'দের মুখে একটা প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

চিত্রা
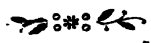
একজন চিত্রকর—

নাম ছিল তা'র অলক, তা'র কেউ নেই, কিন্তু তা'র জীবনের শূন্যতা পূরাবার জন্য এক মানস-সুন্দরী ছিল সে—চিত্রা।

বহুকাল ধরে' প্রত্যহই আলোক-বালারা ভোরের বেলা তা'কে আদর করে' চুমু খেয়ে, তা'র কোঁকড়া চুল, বাতাসের রমণীয় পরশ, কোমল চম্পকাঙ্গুলি দিয়ে যখন মুখ হ'তে সরিয়ে দিত, তখন চিত্রকর তা'দের কোমল স্পর্শে শয্যা-পার্শ্বে উঠে বসত।

সকালের নেই নবীন আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে

নবীন উৎসাহে প্রিয়তমার আরাধনায় বস্‌ত, তা'র মৃণালভুজের একটুখানি পরশ পাবার জন্যে, তা'র সোহাগিনীর মৃদুচুম্বনের তরে সারাবেলা প্রতীক্ষায় বসে থাকৃত, আবার কখন বা ক্ষ্যাপার মত আপন-মনে সাদা কাগজের উপর তুলির কোমল অগ্রভাগ দিয়ে রেখা টান্‌ত।

চিত্রকরের হৃদয়ের গভীরতম গহ্বরে তা'র মানস-প্রিয়ার কত আসা যাওয়ার প্রতিধ্বনি পাওয়া যেত, তা'র কত গীত, তা'র ক্ষীণ সোনালি আঁচলের ক্ষণিক পরশ, অলকের প্রাণে, মুক্ত আকাশের তলায় সবুজ কিসলয়ের পরে নীহার-রেখার মত, মধুর পরশখানি পেত।

অলক চিত্রাকে তা'র নীরব কল্পনার গগনের মাঝে রক্তিম মেঘের মত সোহাগভরে রেখে দিয়েছিল।

সে সংসারের সকল সুখ দুঃখ—চিত্রবালার একটু মৃদুল পরশেতেই ভুলে যেত—তা'র ঐ করুণ ইতিহাস কেউ জান্‌ত না। তা'কে লক্ষ্মীছাড়া ভেবে লক্ষ্মীমন্তরা তা'র কাছ থেকে দূরে থাকৃত। কিন্তু অলক ছিল সত্য সত্যই চিত্রার এক পূজারী।

তা'কে প্রায়ই গর্ব্ব করে' বলতে শুনা যেত যে সে নাকি চিত্রবালার জন্যে তা'র হৃদয়ের তরুণ তাজা রক্ত সঙ্গোপনে রেখে দিয়েছে—যে দিন তা'র মানস প্রিয়ার সাথে প্রথম দেখা হ'বে, সে দিন তা'র মানসীর রাঙা পায়ে তা'র রাঙা রক্ত অঞ্জলি দেবে—একথা শুনে তা'র বন্ধুরা তা'কে পাগল বলে' কত ক্ষ্যাপাতো।

এক দিন খেয়াল-হারা হ'য়ে মানস-প্রিয়ার সন্ধানে ক্ষ্যাপার মত ঘুরতে ঘুরতে ষ্টেশনে এসে পৌঁছুল,—ষ্টেশনে একটী ট্রেণ পশ্চিম যাত্রা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল—অলক আপনমনে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল, যখন টিকিট-কালেক্টররা তা'কে নামিয়ে দিলে তখন সে কাশীতে পৌঁছিয়েছে।

এই বারাণসী কত পুরাতন! কত প্রাচীন-তমমন্দির! সেই জহ্নুসুতা কত দেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছে—যুগের কত অশ্রুজল, কালের কত স্মৃতি, এর সাথে মিশ্রিত হ'য়ে অটল ভরে দাঁড়িয়ে আছে। চিত্রকরের প্রাণ মনের মাঝে আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল—তা'র প্রাণের মাঝে স্মৃতির ছবি নেমে এল।

কিসের এক আকর্ষণে সে নীরবে একলা ধীর-পদ-বিক্ষেপে মণিকর্ণিকার ঘাটে এসে পৌঁছুল—সাম্‌নে গঙ্গা বিশ্বের ঘড়ির মত ক্ষণকাল বিশ্রাম না করে' বহে যাচ্ছে।

এই শ্মশান—কি করুণ—কি সুন্দর—এই শ্মশান যেখানে—একবার না একবার সকলকেই আস্‌তেই হ'বে—উঃ কি সুন্দর—ওই বুঝি চিতা জ্বলে উঠ্‌ল—কোন দুঃখি বুঝি এবার ধরার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিল, তাই বুঝি সে ঐ মহা শান্তির ক্রোড়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।

অলক সোপানের দিকে চেয়ে আপন মনে কি ভাবতে লাগলো; মর্ম্মর সোপানগুলি তা'দের কত কি কথা, তা'দের জীবনের ইতিহাস বল্‌তে আরম্ভ করলো, অলক ধীর হ'য়ে শুন্‌তে লাগল··· অনেক রাত হয়েছে, হাতে তা'র' একটা বাঁশী ছিল; বাঁশীতে ফুঁ দিল—বাঁশীর সুরে তা'র জীবনের ইতিহাস বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, তা'র করুণ সুর গুম্‌রে উঠ্‌ল। বাতাসকে এই করুণ সুরের কাঁপুনি যেন কাঁদিয়ে দিল, বাতাসে কান্নার সুর উঠ্‌ল; নীল গগনের চোখ দিয়ে কান্নার জল

গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাঁশীও থামলো, প্রকৃতির ক্রন্দনও থেমে গেল। অলক বারাণসীর শ্মশান সোপানের কাছ থেকে সেদিনকার মত বিদায় নিল ; তা'র শ্রান্তদেহটিকে ক্লান্ত পদবিক্ষেপে শীর্ণ পর্ণকুটীরাভিমুখে লইয়া চলিল।

চাঁদনী-বালা নৈশবায়ুর অঞ্চল লুটায়ে বাতাসের অদৃশ্য হাতটী দিয়ে পারুল সিউলি মল্লিকার সৌরভের অঞ্জলি দিল।

অলক তা'র পর্ণকুটীরের আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে পড়্‌ল। রাত্রি অনেক, বোধ হয় নিশীথিনীর কোমল স্পর্শে চিত্রকর জেগে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না-বালা তখন মৃদু মিষ্টি হাঁসি হাঁস্‌ছে—চিত্রকরের মনে কল্পনার রেখা দিল। সে ক্ষেপার মতন প্রকৃতিমায়ের জ্যোৎস্নাদীপের আলোয় সে তা'র প্রিয়ার 'প্রকৃত' ছবি আঁকবে ঠিক কর্‌ল।

সে তা'র লাল রক্তের মত রঙ্গ গুলে তার ক্যানভাসের সাদা নিষ্কলঙ্ক বুকে রঙের দাগ কেটে পলে পলে সেই রাত্রেতেই প্রিয়ার কল্পিত মুখের কপোল রঞ্জিত করতে লাগল।

তা'র কোমল তুলির রেখায় ক্রমশঃ প্রিয়তমার

দেহ প্রস্ফুটিত পদ্মসম ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে' উঠ্‌তে লাগল। এমনি সময় কা'র কোমল মৃণাল বাহুর স্পর্শে, নিজেতে হারাণ ক্ষেপা চিত্রকরের প্রাণ চকিতে চম্‌কে উঠ্‌ল, সে পাগল পারা চোখ দুটীকে তুলে দেখ্‌ল—যে কল্পিত রাণী, যে মানসীর জন্য আজ ক্ষ্যাপার মত গৃহহীন হয়ে' দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য নিজের হৃদয় দিয়া মানসীকে চিত্রিত করছিল—সেই তা'র মতই দেখ্‌তে একটী তরুণী ছবির ক্যানভাসের দিকে পলক হীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অলক পাগলের মত জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মানসী সুন্দরী—আমার,—চিত্রা—সেই—তুমিই—তুমিই তুমিই কি আমার প্রাণের চিত্রা—ওগো—তুমিইত আমার চিত্রা—ওইতো চাউনি—ওইতো—চুল—

তুমিই আমার।"

অলকের মনে হ'ল, যেন প্রিয়া তা'কে বল্‌ছে "কৈ রাঙা রক্ত, আমার উপহার কৈ," চিত্রকরের মনে হ'ল, সত্যইত সে তা'র প্রিয়াকে বুকের রাঙা রক্ত উপহার দিবে বলে' প্রতিজ্ঞা করেছিল সে তা'র

বুকের ভিতর থেকে একখানি শাণিত ছোরা বের করে' ব'ল্লে, "প্রেয়সী আমার—কতকালের সাধনার ধন—কেবল তোরিই জন্যে আমার এতকালের সঞ্চিত ধন আজ কত কালের সাধনা—আজ মৃত্যুর মোহন শয্যায় তোরে আলিঙ্গন করি—আয় প্রেয়সী আমার, হৃদয়ে আয়।" সে বুকের উপর ছুরি বসিয়ে দিলে, এক ঝলক রক্ত ফিনকি দিয়ে ছবির উপর পড়ে' তা'র প্রিয়তমার চিত্রের গণ্ড গোলাপী করে দিলে—

সব শেষ!!!

পুরীযাত্রী।

—ঃ০০ঃ—

আমি পড়তুম্ বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সায়ান্স কলেজে, হোষ্টেলে থাকতুম্। মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—প্রায় আড়াই মাস টানা গরমের ছুটি। পশ্চিমে দুপুর বেলা ভীষণ "লু" চলে—আমার কলকাতায় আসবার কথা ছিল, কিন্তু খেয়াল-রাণীর খেয়ালি হাতে পড়েই বোধ হয়, স্কলার্‌শিপের টাকা দিয়ে, পুরীর প্রকৃতিমায়ের কোমল ক্রোড়ে পূর্ণিমার নির্ম্মল জোৎস্নাবালার মৃদু হাসি, সাগরের বিশাল তান-পুরার সেই একটানা সুর, আর মলয়-বালার কমনীয় করের ক্ষিপ্র অঙ্গুলীর পরশ সেই সব

পাবার জন্য আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কলেজের অনেক ছেলে তখনো হোষ্টেলে ছিল, কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, সকলের মনে স্ফূর্ত্তি আর ধরছিল না; তাদের হর্‌রাহাসিতে হোষ্টেলের Room গুলো যেন প্রতিধ্বনিত হ'য়ে হেসে উঠছিল—সব জমজমাট সবই হাসি—কত ঠাট্টা তামাসা চলছে—মাথায় তাদের ভাবনা চিন্তার একটু লেশমাত্র ছিল না—তা'রা যেন হাসির সাগরে ডুব দিয়ে ছিল। কেবল আমি তখন একা নির্জ্জনে আমার Roomএর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আপনমনে পুরীর দৃশ্য কল্পনার চক্ষু দিয়ে দেখছিলুম—দেখছিলুম্ সেই অনন্ত নীল সাগরের অফুরন্ত খেলা, আর তার সাথে কত ফেনার ফোয়ারা অবিরাম নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে—সেই মহাসমুদ্রের খেলা আমি কলেজের হোষ্টেলে বসে' বসে' দেখছিলুম। আমরা কলেজের ছেলে পাঁজী দেখতে জানতুম না, তবু লোকের মুখে শুনেছিলুম—

"হুড়্‌দ্দুম্ যাত্রা যার, সর্ব্বসিদ্ধি তার।"

তাই তার পরদিনের ট্রেনে কলিকাতায় যাবার জন্য ঠিক করলুম। আমি ছিলুম কলেজের মধ্যে

ভাল Sporst-man ; আমার সব বিষয় জানা ছিল —টেনিস্ হকি জিম্‌নাষ্টীক ক্রিকেট্—এসব ছিল আমার এক চেটে। Indoor Gamesএর মধ্যে Bridge. Caram এই সবে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান কখনও পাইনাই। আজ এমন দিনে কলেজের ছেলেরা আমাকে না পেয়ে তা'দের খেলা মোটে জোম্‌ছিল না—তারা দু তিন বার আমার দরজায় ধাক্কা মেরে ছিল। কিন্তু কি জানি কেন আমি এত কল্পনায় বিভোর ছিলুম যে কিছুই শুনিতে পাইনাই —তারা দরজা বন্ধ দেখে সব ফিরে গেছে। আমি যখন দরজা খুললুম তখন সব হুড়মুড়িয়ে ঘরে দাঁড়ালো—বীরেন হরিশ আমায় কোয়েশ্চন এর পর কোয়েশ্চন করে বিব্রত করে তুল্লো। তারপর যখন শুনল যে কালই আমি একবারে পুরীর তরে রওনা হচ্ছি, তখন সকলে একেব্বারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কেবল নলিন একটু কবি গোছের ছিল —সে শিষ দিয়ে গেয়ে উঠ্‌লো

কার তরেতে এমন ধারা
সন্ধ্যা সকাল পাগল-পারা
কোন প্রিয়ার ঐ সন্ধানে ?

আমি গানের শেষটা শুনে মনের ভিতরেই চ.কতে চম্‌কে উঠলুম। নলিন্ ছিল কলেজের মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—দুজনে এক সাথে পাশ হয়েছি, দুজনেই প্রায় Scholarship পেতাম। নালন আমার যাবার কথা শুনে সেও বলে উঠলে, 'ভাই সুধীর আমিও তোর সাথে যাব'—আমি বলে উঠলুম "চলনা ভাই—একলা আমোদ কখনও করতে পারা যায়' ?

তারপর দিনেই আমরা কলকাতায় যাবার জন্য ছাড়লুম।

কলকাতায় নলিনের বাড়ীতেই দু দিনের তরে guest হওয়া গেল। খুব গরমীর দিনে Lemonade ও Icecream খাবার পর তৃতীয় দিনে আমরা শ্রীক্ষেত্র যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমাদের একটী second class compartment পূর্ব্ব হ'তে reserved ছিল, সেই জন্য trainএ আমাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি। আমাদের মাল ছিল মোটে দুজনার দুটী Suit-case ও দুটী bedding—এ ছাড়া আমার সাথে অনেক বাজে জিনিষ ছিল—বাঁশী camera ও ছবি আঁকবার

নানা সরঞ্জাম ইত্যাদি। তারপর ৮-২৪ মিনিটে express এ চড়া গেল। এখন দামোদরের Bridge এর কাছে আমি বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলুম্—গানটা ছিল নলিনের তৈরী—

"আমি একলা আপন-হারা
আমি ধরায় বাঁধন-হারা
ক্ষেপার মত ঘুরে হই যে গো সারা
মোর ছিন্ন হিয়ার ব্যথার সুরে
বাজছে কারগো একতারা—?"

রেলের বাঁশীও আমার গানের সাথে সুর মেলাতে লাগলো।

(২)

সেদিন ছিল পূর্ণিমা, একাকী পুরীর, Beach এর উপর বসেছিলাম। কেহ নেই কাছে—নলিন তার কোন আত্মীয়ের-সাথে দেখা করতে গিয়েছিল —কেবল আমি সঙ্গী হীন—সাগরের বালুরাশির একটী ধারে একাকী সাগরের বিরাট সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লেগেছিলুম—অপূর্ব্ব শোভা! সারা সাগরটা সাদা আর নীলে মেশান ছিল, আর

কতকটা অস্পষ্ট ; আর যেথায় চাঁদনী-রাণী জ্যোৎস্নার মাঝে বসেছিলেন, সেখান হ'তে সাগর পর্য্যন্ত যেন স্বপ্নের সুপ্তলোকের অতুল রত্নসম্পদে ভরিয়ে দিয়ে যাবার তরে, যেন হীরের টুকরো পথ বানিয়ে দিয়েছিল।

আমি তখন বিশাল সাগরের অপরূপ সৌন্দর্য্যের ক্ষণে ক্ষণে রূপের লীলা নিরীক্ষণ করে' কি জানি কি একরকম হয়ে গিয়েছিলুম, আমি কখন যে আপনাকে ভুলে গিয়ে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছিলুম, তা আমি নিজেই জানতুম না। বাঁশীর সুর অনন্তের ক্রোড়ে ঘুরে ফিরে আমারই কাছে ফিরে আসতো ; আমার চারিধারে কতলোক ঘিরে দাঁড়াতো, আমার কি জানি কি ব্যাকুল সুরে তাদের চোখ সজল হয়ে উঠতো, তাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়ত—আমি অতিরিক্ত লোক সমাগম দেখলে বাঁশী বন্ধ করে' উঠে পড়ে', জ্যোৎস্না পুলকিত বেলাভূমির নির্ম্মল শেষ সীমায় একটী শুভ্র বালুর ঢিপির উপর বসে' ফের বাঁশীতে ফুঁ দিতুম। বাঁশী আবার একই সুরে গুমরে উঠ্‌তো। আমি প্রায়ই একলা সেই জায়গাটিতে

এসে একই সুরে বাঁশীতে ফুঁ দিতুম্। বালুর ঢিপিটী এই ক'দিনেই আমার সাথে ভাব করে ফেলেছিল—আমায় দেখতে পেলে দূরে থেকেই যেন আমাকে আহ্বান করে' তা'র সাদা বালির আসন পেতে দিত।

(৩)

একদিন একলা সেই আমার চিরপরিচিত বালির ঢিপিটীর উপর বসে' একটী করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিলুম—এমন সময় উপর দিকে মুখ তুলতে হঠাৎ চেয়ে দেখি, দুটী অজানা মুখ আমার পানে আমার করুণ গানের সুরে যেন সজল চাহুনি নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে—একটী ছিল তরুণ যুবা ও অপরটী কিশোরী বালিকা। যুবকটী ঢলঢলে পা-জামা পরিহিত—তাহার কোমল মুখ ও মিষ্টি চাহুনি—কিশোরী বালিকাটী যেন জ্যোৎস্নার প্রতিমূর্ত্তি।

আমি তখন ছিলুম Collegeএর নবীন ছাত্র—আমার তখন রঙ্গিন জীবন; আমি আকুল প্রাণে বালিকাটীর ফুটন্ত জুইয়ের মত মুখটীর পানে পলক্-হীন চাহুনীতে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে ফেললুম। সেইদিনই তাদের সাথে আমার প্রথম দেখা এবং

সেইদিনই প্রথম আমার সাথে তাদের ভাব হ'য়েছিল—তারা ছিল নাকি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। বালিকাটীর নাম ছিল সুভদ্রা, যুবাটীর নাম শিবনাথ।

তা'দের সাথে কথা কহিতে কহিতে তা'দের দেশের গল্প শুনতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—সেদিনকার জন্য তাদের কাছ হতে আমি বিদায় নিয়াছিলাম ; কেবল কিশোরী বালিকাটী বিদায় নেবার বেলায় তার আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে, তার মনের কত কি প্রাণের গোপন কথা নীরব চোখের চাহুনীতে যে বলে গেল, তা শুধু আমি বুঝতে পেরেছিলুম। সাগরতট দিয়ে যাবার বেলা নলিনের সাথে দেখা হল, সেও একদল লোকের সাথে ভাব করে' তখন গান গাইতেছিল।

"চাঁদ হাস হাস।"

আমাদের বাড়িটী ছিল সাগরের জলরাশির খুব আপনার লোক। সাগরের ঢেউগুলি বাড়ীর সাথে নেচে নেচে বিনা কথায় যে কত কি কথা বলতো, তা সে বাড়িটী জানতো আর মহাসাগর জানতো। আমি বাড়িটির পাথরের সিঁড়ির ধাপের উপর

বসে' বসে' সারা বেলা সাগরের অনন্ত রূপের লীলার প্রতিকৃতি আঁকতে চেষ্টা করতুম্। কত দুপুর বেলায় সুভদ্রা আমার পাশটীতে বসে পলক-হীন দৃষ্টিতে আমার ছবির পানে চেয়ে চেয়ে দেখতো ; কখনও বা তাদের দেশের কত গল্প, কত কথা আমায় ভালবেসে শোনাতো—কি সুন্দর তার গলার আওয়াজ—যখন সে আমার সাথে গল্প করতে করতে তার ভাইকে 'সূয্যি ভাই' বলে ডাকতো, (শিউজি ভাই থেকে সূয্যি ভাই হয়েছে) তখন আমার হৃদয় তার কোমল কথার সুরের ঝঙ্কার দিয়ে যেত।

বিকেল বেলা হ'লে আমরা সব একসাথে দল বেঁধে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসতুম্। আমি বালির ধারে বসে' যখন বালির ঘরবাড়ী সুড়ঙ্গ তৈরী করতুম্, তখন সুভদ্রা আমায় একমনে সাহায্য করতো। সূয্যির সাথে নলিনের খুব মিল হয়েছিলো, দুজনেই কবিতা লিখতে পারতো, দুজনেই দুজনকে নিত্য নিজের তৈরী নূতন নূতন কবিতা শুনাতো। আমরা অনেক রাত অবধি সাগর-ধারে বসে' জটলা পাকাতুম্—কত গল্প চলতো।

শেষে অনেক রাত হ'লে যখন বেলাতট জনহীন হ'য়ে পড়তো, তখন আমি আমার কোলের কাছ থেকে আমার বাঁশীটীকে উঠিয়ে নিয়ে ফুঁ দিতুম্— নলিন গান গাইতো—"কেগো তুমি বিরহিণী"... তারা ধীর হয়ে আমাদের এই বিদেশী গান উপলব্ধি করতো।

(৪)

একদিন নীরবে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে সোপান-শিলার' পরে বসেছিলাম—বোধ হয় আমার হাতে ছিল তখন রঙ্ মেশাবার কাঁচের Palate, পাশে বোধ হয় কতকগুলি Windsor Newton রঙের Tube ছড়াছড়ি যাচ্ছিল। ছবির খাতায় যখন সুভদ্রার মুখের Sketch-টীতে নূতন রঙ্ লাগাচ্ছিলুম্, তখন কাগজটা শুকোয় নি, তাই ধারে রেখে ফুঁ দিয়ে শুকোচ্ছিলুম্, আর মনে মনে কত কি সুখের স্বপ্ন গড়ে' তুলছিলুম— ছবিটা খুবই চমৎকার হয়েছিল।

সুভদ্রা জানালার ধারে বসে' মালা গাঁথছে, আর তার মুখে এক ঝলক্ সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি

পড়েছিল’—আমি আপন মনে ছবিটী শুকনো হবার পর কি রঙ্ দেব তাই মনে মনে ঠিক্ করছিলুম্; এমনি সময় বাড়ীর ভিতরে থেকে শোনা গেল;—“Urgent Telegram আয়া হ্যায়।” আমি একমনে এত ছবির দিকে চেয়েছিলুম্ যে, Telegraph Peon কখন যে এই রাস্তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে তা’ আমি মোটেই জান্‌তে পারিনি, আমি তাড়াতাড়ি sign করে দিয়ে Telegramটী হাতে নিয়ে দেখি যে আমারি Telegram, তারপর খামটী ছিঁড়ে দেখি যে, মায়ের ভীষণ অসুখ করেছে—আমাকে যেতে হবে; আমি ছুদিন বাদ যাব ঠিক করলুম্।

(৫)

আমি যেদিন যাই সেদিন ভীষণ বাদলা—ধূসর রংয়ের মেঘ বিষাদের মত সারা আকাশের মুখটাকে যেন সেদিন ঢেকেছিল। যদিও সেদিন পঞ্চমী কিন্তু চাঁদনি-বালার নির্ম্মল জ্যোৎস্নামাখা হাসি সেদিন আর দেখতে পাওয়া যায় নি। আমায় ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে অনেকেই ষ্টেশনে এসেছিল।

সুভদ্রা সূর্য্যিও এসে ছিল, কিন্তু সকলের মুখই, সেদিন আমায় বিদায় দিতে, প্রকৃতির বিষাদমলিন মুখে র মত বিষাদের মেঘে ঢেকে গিয়েছিলো।

যাবার বেলায় সকলের সাথেই ম্লানমুখে Handshake করে' বিদায় নিয়ে ছিলুম—কেবল সুভদ্রার কম্পিত মৃণাল বাহুর একটুকু পরশ বিদায়ের শেষ স্মৃতি চিহ্নের মত নিয়ে, কোন্ সুদূরে রওনা হলুম। বিদায়ের বেলা শুধু তাকে আমার হাতে আঁকা তারই ছবিখানি, একটি ক্ষুদ্র কবিতা ও আমার করুণ বাঁশীর ক্ষীণ সুরের রেখা দিয়ে তার কাছ হ'তে বিদায় নিয়েছিলুম—সে শুধু বিষাদ-মাখা হাসি হেসে দুফোঁটা করুণ অশ্রুবারি ফেলে যেন নীরব কথায় বল্লে; "বন্ধু—দেখা হবে—আবার দেখা হবে—হয়ত এ জন্মে না হতে পারে কিন্তু—

আরজন্মে—!"

* * *

রোজ প্রাতঃকালে যখন সূর্যিদেব ঘুমের রাণীকে ডেকে নেন, যখন পাখীদের কাকলিতে

জগৎ সজীব হয়ে মুখরিত হয়ে উঠে, আমিও তখন জেগে উঠি। এখনও সেই সুভদ্রার শেষ কথায় ক্ষীণ রেখাটুকু আমার কোমল হিয়ায় স্মৃতির দ্বার খুলে একবার করে' এসে এখনও দেখা দিয়ে যায়—এখনও আমি আমার সেই হাতের মাঝে রোজ ভোরের বেলা তার প্রতিকৃতি যেন দেখতে পাই।

সংকীর্ণতা দূর হইয়া প্রসন্নতা আনয়ন করে, ইহাই 'সপ্তস্বর' খণ্ড-কাব্যের বিশেষত্ব। চিত্রকর তুলিদ্বারা চিত্রের সুপবিত্র গুপ্তভাব সকল চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করেন, সুকবি চিত্তাকর্ষক মনোহর বাক্যবিন্যাস দ্বারা হৃদয়রাজ্য অধিকার করেন। কাব্য ও কবিতার সহিত চিত্তাকর্ষক চিত্রের যেরূপ মিলন হওয়া আবশ্যক, তাহার সার্থক মিলন হইয়াছে। কবিতা পাঠান্তে বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপ চিত্র পাঠকের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহাকেই কাব্যের প্রসাদ গুণ বলে। আমাদের বিশ্বাস অভিজ্ঞ চিত্রকরের অঙ্কিত দর্শনকারি সুন্দর চিত্র ও সুকবি বিরচিত হৃদয়গ্রাহী কবিতা উভয়ের তারতম্য অতি অল্প। যে চিত্রে প্রকৃতিতে সুন্দর ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে তাহাই সুচিত্র এবং যে কবিতার রচনা সরল স্বাভাবিক সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী বাক্যে বিষয় সকল বর্ণিত হয়, তাহাই সুকাব্য। 'সপ্তস্বর'—খণ্ড কাব্যখানি উভয়গুণে গৌরবান্বিত; গ্রন্থকার এক-জন প্রতিভাশালী সুকবি, কবিতাগুলির অধিকাংশই পবিত্রভাব পূর্ণ; প্রত্যেক কবিতায় কবির কবিত্বের প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, আমরা 'সপ্তস্বর' খণ্ড কাব্যখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীত হইলাম!" জন্মভূমি ফাল্গুন, ১৩২৩।

"কবিতাগুলির পরিচয়ে নূতনত্বের বিকাশ! এই গ্রন্থ-নিবদ্ধ কবিতাগুলি সাতটী সুরে বিভক্ত—যেন সাতটী সুরের ধাপ ইহাতে ক্রমান্বয়ে উঠিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতাজ্ঞ যে কেহ কবিতা পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

"রসাত্মকং বাক্যং কাব্যং"

"আনন্দ বিশেষ জনকং বাক্যং কাব্যং"

যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আলোচ্য গ্রন্থে যে ইহার মর্য্যাদাহানি হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায়। কবিতাগুলি হেয়ালিতে অস্পষ্টতায় দুষ্ট নহে।" বঙ্গবাসী ২রা আষাঢ় ১৩২৪।

"ছবিগুলি ভাল। কবিতাগুলির সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা। কোথাও ভাবের জটিলতা নাই; অর্থবোধে বিভ্রাট নাই। ছন্দগুলির গতি অবাধ। সপ্তস্বর' কণ্বমুনির আশ্রম, কণ্বের কুটীর, গার্গী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কবিতাগুলি উচ্চভাব পূর্ণ। ভক্ত কবিতাটী অতি সুন্দর। বাঙ্গালী পাঠক 'সপ্তস্বর' পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবেন, এমন আশা আমাদের আছে। অর্ঘ্য আষাঢ় ১৩২৪।"

"গ্রন্থকার প্রার্থনা করিয়াছেন—"হৃদয়ের শিখরে সঙ্গীতের যে ক্ষুদ্র নির্ঝর ছুটিয়াছে, তাহা সুবিশাল ভাব-নদীতে পরিণত হইয়া জীবনের উপকুল প্লাবিত করুক।"—স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক আমরাও উহাতে সর্ব্বান্তকরণে যোগদান করি। লেখকের যৌবন প্রারম্ভের প্রথম উদ্যমের সাফল্য স্বরূপ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। উদ্বোধন চৈত্র ১৩২০।

ঋতেন্দ্র বাবুর আর একখানি কাব্যের মধুর ঝঙ্কার—

পদরাগ

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত

মূল্য মাত্র —৸৹

পদরাগের সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত:—

"গানগুলি সুরচিত ও হৃদয়গ্রাহী, প্রত্যেক গানের ভিতর দিয়া ভক্তিরসের পবিত্র ধারা বহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।" হিতবাদী ১২ই আশ্বিন, ১৩২৮

জন্মভূমির সম্পাদক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিতেছেন দেখুন—

"আপনার রচনার আমি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, সাহিত্যামোদী পাঠকেরাও ভালবাসেন। ইহা আমার তোষামোদ বাক্য নহে, আন্তরিক উচ্ছ্বাস।" ২০-৩-১১।

বাণীর কমলবনের মধুপ সাহিত্যিকদিগের লীলাভূমি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির কয়েকটি মাত্র অভিমত পাঠ করিলেন।

বাগান

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি মধুর কবিতা-গ্রন্থ নূতন প্রকাশিত হইল।

"বাগান" ফলে ফুলে পরিশোভিত ও নানা বৃক্ষের সুশীতল ছায়ার আরামপ্রদ, বিহগের কাকলিতে প্রতিধ্বনিত—যাহারা দিনরাত সংসারের কার্য্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা বাগানের ফুলের সৌরভে, "পঞ্চবটী"র শীতল ছায়ায় বসিবেন আসুন—নানা বিহগের কাকলি ধ্বনির মধুর সঙ্গীতে আপন-হারা হইয়া ক্লান্তির কথা বিস্মৃত হইবেন—

দূর হইতে দখিণ বাতাসের উতলা হাওয়া বাগানের সুগন্ধি ফুলগুলির গন্ধ বহিয়া আনিয়া আপনাকে উতলা করিয়া তুলিবে, আবার শরত রাতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় বাগানের ফুটফুটে ছবি দেখিয়া বিমোহিত হইবেন।

অনেকগুলি ত্রিবর্ণ চিত্র বাগানের শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

সোনার জলে লেখা বিলাতী বাঁধাই,

উপহার দিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সারদা

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেকখানি সারগর্ভ নূতন ধরণের প্রবন্ধ-পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

ইহাতে নানা আধ্যাত্মিক বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুগভীর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। চিন্তাপূর্ণ অনেক নূতন নূতন সার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকায় পুস্তকখানি সকলেরই আদরের বস্তু হইবে।

ইতি
বিনীত প্রকাশক
শ্রীপরেশনাথ দত্ত
৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।